ছাত্রলীগের নৃশংসতার বলি মেধাবী ছাত্র আবরার ফাহাদ

এ এন রাশেদা

| ঢাকা , শুক্রবার, ১১ অক্টোবর ২০১৯

ঠিক মনে নেই, দশ বা পনেরো বছর আগে আবদুল গফফার চৌধুরী লিখেছিলেন, যার মর্মার্থ হলো আওয়ামী লীগN ছাত্রলীগকে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত না করে বা কোনো প্রকার প্রশিক্ষণ না দিয়ে অন্য দলের প্রশিক্ষিত লোকদের দলে নিয়ে দল পরিচালনা করছে। এতে সাময়িক লাভ হলেও ভবিষ্যতে এর খেসারত দিতে হবে। কথাটি যেহেতু আমি নিজেও লালন করি তাই আমার স্মরণে আছে। গত ৭ তারিখ রাতে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের পদবিধারীরা তাদের সাথী আবরারকে নৃশংসভাবে হত্যার মধ্য দিয়ে যে নজির স্থাপন করল, তা লোমহর্ষক ও প্রচ- বেদনাদায়ক।

প্রশ্ন ওঠে, ছাত্রলীগের এই কর্মকা- কি এই প্রথম? তা তো নয়। স্মরণ করা যায় দেবাশীষ নামের সেই হতভাগ্য ছেলেটির কথা- যাকে প্রকাশ্য দিবালোকেই ছাত্রলীগের দুর্ধর্ষ খুনি বাহিনী হত্যা করেছিল। বিচারে কি আসল খুনি শাস্তি পেয়েছিল? কিছুদিন পূর্বে বরগুনার এমপিপুত্র তার বাহিনী ‘নয়ন বন্ড’ দ্বারা কিভাবে ওই প্রকাশ্য দিবালোকেই হত্যা করল রিফাতকে। ছাত্রলীগের

নিজের দলের নেতাকে হত্যার কাহিনীও কম নয়। প্রায় অর্ধশতাধিক। ছাত্রলীগ নেতা মনিরুজ্জামান বাদলকে জগন্নাথ হলের প্রভোস্টের বাসার গেটে হত্যা করা হয়েছিলÑ যখন শামসুন নাহার হলের সামনে নির্মিত মঞ্চে তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারা দেশেই আছে এমন করুণ কাহিনী। যারা ছাত্রলীগের অতীতের গর্বের কথা অনর্গল বলেন তারা ছাত্রলীগের অন্ধকার দিকটি স্বীকার করেন না; যা হওয়ার তাই হচ্ছে।

একটা সময় ছিল যখন এই বাংলা অঞ্চলে কৃষকরা জমিদার-জোতদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে তুলেছিলেন। যেমন উত্তরবঙ্গে রংপুর-দিনাজপুরে তেভাগার আন্দোলন, সিলেটে নানকার আন্দোলন, ময়মনসিংহে টংক আন্দোলন, দক্ষিণাঞ্চলের কৃষকের আন্দোলন প্রভৃতি। অন্যায়, জুলুম ও শোষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও অভিজ্ঞতা ছিল। প্রগতিশীল রাজনীতির চর্চা ছিল গ্রামের পর গ্রামজুড়ে মানুষের মধ্যে। তার প্রভাব শহরের ছাত্রসমাজের মধ্যেও পড়েছিল। তাই ১৯৫২ সালের পর থেকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রগতির ধারায় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন গড়ে উঠেছিল। বঙ্গবন্ধু ছাত্রলীগ গড়ে তুলেছিলেন ১৯৪৮ সালে। এক সময়ে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন সমানে সমান ছিল। কিন্তু ১৯৬৫ সালে ছাত্র ইউনিয়ন রাশিয়া ও চীনের রাজনীতির দর্শনে ভাগ হয়ে গেলে ছাত্র

ইউনিয়ন স্বাভাবিকভাবে পূর্বের চেয়ে কিছুটা দুর্বল হলেও দেশব্যাপী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তাদের কমিটি ছিল। কলেজ সংসদ নির্বাচনে সমানে সমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। কিন্তু ছাত্রলীগের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা ছিল প্রচ-ভাবে। সে কারণে বেশিরভাগ মেধাবী ছাত্র ছাত্রলীগ থেকে দূরে থাকত। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সেøাগান উঠলে ছাত্রলীগ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত। কৃষক, শ্রমিকসহ সুবিধাবঞ্চিত সব স্তরের মানুষ নিয়ে কোনো ভাবনা তাদের ছিল না বা তাদের জানানোর কোনো কার্যক্রম আওয়ামী লীগেরও ছিল না।

ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্রে ঐক্যের স্থান নেই। আছে শিক্ষা, শান্তি, প্রগতি। পক্ষান্তরে ছাত্র ইউনিয়নের গঠনতন্ত্রে আছে ঐক্য, শিক্ষা, শান্তি, প্রগতি। এ কারণেই '৫২, '৬২, '৬৯ এবং '৭৫ পরবর্তীতে '৮৩ ও '৯০ সালে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে ওঠা সম্ভবপর হয়েছিল। '৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর ডাকে ছাত্র ইউনিয়ন-ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টি গেরিলা বাহিনী গঠন করেছিল ভারতের মাটিতে এবং পাক-বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। সেদিন যদি তারা এই যুদ্ধে না থাকত তাহলে ভারতে সিপিআই (কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া) প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে সৎ পরামর্শ দেয়ার সুযোগ নাও পেতে পারত। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি যদি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ না করত এবং তাদের পার্টি ফোরামে সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করতÑ তাহলে সোভিয়েত ইউনিয়নও আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা নাও করতে পারত সঠিক তথ্যপ্রবাহ না পাওয়ার কারণে। আর

১৯১৭ সালে মহান বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত না হলে দেশে দেশে শোষিত-বঞ্চিত মানুষের মুক্তির কাফেলা এগিয়ে যেতে পারত না। এ বিষয়গুলো অনেকেরই জানা প্রয়োজন, যারা রাজনীতিতে আসবেন।

১৯৭০ সালে কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশ্যে ছিল না। ন্যাপের মধ্যে কাজ করত। যুদ্ধকালীন তারা প্রকাশ্যে কাজ করেছে। বঙ্গবন্ধু কমিউনিস্টদের অবদান স্বীকার করেছেন ১৯৭৩ সালে কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে ও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের দশম কংগ্রেসে এসে। পার্টি কংগ্রেসে তিনি বলেছিলেন, ‘আজ স্বাধীন বাংলাদেশের বুকে আপনারা আপনাদের কংগ্রেস করতে পারছেন। বিগত ২৫ বছরের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং আমার সহকর্মীরা, যারা আমার সঙ্গে কাজ করেছেন তারা-আমরা দেখেছি যে, কি দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে, কি অত্যাচার-অবিচার সহ্য করে আপনাদের কাজ করতে হয়েছে। কারাগারে যখন বন্দী ছিলাম দেখেছি কমিউনিস্ট পার্টির শত শত কর্মী বছরের পর বছর বন্দী অবস্থায় রয়েছে। ...কোনোদিন আপনাদের সুযোগ দেয়া হয় নাই। আপনাদের পার্টিকে বেআইনি ঘোষণা করে পার্টির কর্মীদের ওপর অত্যাচার চালানো হয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাস এক করুণ ইতিহাস। প্রগতিশীল কর্মী মানেই, তা সে যে দলেরই হোক না কেন, তাদেরই অত্যাচার, অবিচার, জুলুম সহ্য করতে হয়েছে। ১৯৫৬ সালে কিছুদিনের জন্য যখন আওয়ামী লীগের কোয়ালিশন সরকার

গাঠত হয়োছল, কামডানস্ট পাাট কিছুাদনের জন্য সূর্যের আলো দেখেছিল।'

কথাগুলো বলার অর্থ হলো রাজনীতির পাঠশালায় দেশ-বিদেশের অধিকারবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সচেতন মানুষের লড়াই সংগ্রামের যে ইতিহাস, সে সম্পর্কে জানাটা জরুরি। এর মধ্য দিয়েই জন্মায় বিবেকবোধ, মানবতাবোধ, বিশ্বভাতৃত্ব, মানুষের প্রতি ভালোবাসা প্রভৃতি। অথচ ছাত্রলীগে এ চর্চা একেবারেই অনুপস্থিত। নেতার পেছনে ঘোরা, প্রটোকল ডিউটি দেয়া, হল-হোস্টেলের ক্যান্টিনে ফাও খাওয়া, রিকশা, ভ্যান, সবজি বিক্রেতা সবার কাছ থেকে চাঁদা আদায় করা, ছাত্রলীগ না-করলে তাকে শত্রুজ্ঞান ভাবা, তাদের কর্মকা- শুধু বাধা দেয়া না, প্রচ- রকম অত্যাচার নির্যাতন করাই ছাত্রলীগ তাদের দায়িত্ব বলে মনে করে। এভাবেই সকল হল-হোস্টেলে তারা নিজেরদের 'রাজনীতির' ছাপ রাখে। সেই চর্চাটারই চাক্ষুষ প্রমাণ বুয়েটে জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেল মেধাবী ছাত্র আবরার। দেশবাসী আবারও প্রত্যক্ষ করল আরও এক নির্মম হত্যাকা-ের কাহিনী। এ নৃশংসতা তারা স্বাধীনতার পর থেকেই দেখিয়ে আসছে। মনে পড়ে ১৯৭৩ সালে বগুড়ায় সাত রাস্তার মোড়ে প্রকাশ্য দিবালোকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছিল ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী প্রদীপকে। ফরিদপুরে হত্যা করা হয়েছিল নৌকা থেকে নামিয়ে এনে বাজারের মধ্যে ধাওয়া করে ধরে ছাত্র ইউনিয়ন নেতা বিষ্ণু, কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ওয়ালিউর রহমান লেবু, কমলেশ

বেদজ্ঞুসহ পাঁচজনকে। এরপরও বহু হত্যাকা- সংঘটিত হয়েছে। ২০১৩ সালে নারায়ণগঞ্জে আওয়ামী লীগ নেতার টর্চার সেলে জীবন প্রদীপ নিভে গিয়েছিল আরেক মেধাবী ছাত্র ত্বকীর। ত্বকীর হত্যাকারীরা আজও বুক ফুলিয়ে সদম্ভে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সরকারের সদিচ্ছার ওপর এসব বিচার নির্ভর করবেÑ এটি কারও কাম্য হতে পারে না।

বুয়েটের শিক্ষার্থীরা বুয়েটে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে বলেছেন। তার কারণ হিসেবে এক ছাত্রী ছাত্রলীগ নেতাদের কদর্য দিকটি তুলে ধরে বলেনÑ ‘আমরা এসব দেখতে চাই না।’ ছাত্রীটির কথার যৌক্তিকতা আছে। কারণ বুয়েটে চিন্তা ও মননে পরিশীলিত শিক্ষার্থীরা তাদের জন্য কল্যাণকর কোনো সংগঠনকে দেখতে পান না। কারণ ছাত্রলীগ কোনো প্রগতিশীল সংগঠনকে দীর্ঘদিন ধরেই কাজ করতে দেয়নি। ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করার স্বাভাবিকভাবে সেই দাবিই উত্থাপিত হয়েছে। এর আগে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে আরও সুস্পষ্ট হয়েছিল মৌলবাদী রাজনীতিসহ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশ্যে রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকা অবস্থাতেই হত্যাকা- সংঘটিত হয়েছিল; আর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকার সময়েই হত্যা-খুন বৃদ্ধি পেয়েছিল। এসবই দ-যোগ্য অপরাধ, রাজনীতি নয়। কাজেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোনো অপরাধ সংঘটিত হওয়ার প্রক্রিয়া বন্ধ করতে চাইলে তা সরকারকে বন্ধ

করতে হবে। সরকারের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর এসব নির্ভর করে। সরকার প্রধানের বিনা হুকুমে দল এবং সরকারের কর্তাব্যক্তিরা কেউ কিছু করেন না বলে সমালোচিত হচ্ছেন। কাজেই দেশবাসী কি ধরে নিতে পারেন নাÑ কোনো কাজই তার অগোচরে হচ্ছে না? তাই তিনি নির্দেশ দিলেই সব বন্ধ হবে। তাহলে রাজনীতি নিষিদ্ধ করলে হত্যাকা-, অত্যাচার, জুলুম, নির্যাতন বন্ধ হবে বলে যে আশাবাদ কোমলমতি শিক্ষার্থীরা করছেন- সে আশা কতটুকু সফল হবে? সে প্রশ্ন থেকেই যায়। আর বুয়েটের ভিসি সাহেব যে ৩৬ ঘণ্টা শিক্ষার্থীদের সামনে এলেন না, এমনকি জানাজায়ও এলেন নাÑ তাও কি সরকার প্রধানের নির্দেশে; এটাও এক মিলিয়ন ডলার প্রশ্ন। সরকার প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আবরার হত্যায় জড়িতদের শাস্তি পেতেই হবে।' এই অঙ্গীকার ত্বকী হত্যাকারীদের শাস্তির বেলায় এতদিন গত হলেও কেন উচ্চারিত হলো না? এমন অনেক উদাহরণ দেয়া যায়। ছাত্রলীগ এ যাবত বহু হত্যাকা- ঘটিয়েছে। গত ৬ অক্টোবর ২০১৯ রাতে যে নৃশংস ঘটনা ঘটল, তা ওই পূর্বসূরীদের ঐতিহ্য ধরেইÑ এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। দেশ হারাল এক মেধাবী শিক্ষার্থী। মা-বাবা হারাল তাদের নাড়িছেঁড়া ধনকে। সতীর্থরা হারাল তাদের প্রিয় সাথীকে।

[লেখক : সম্পাদক, সাপ্তাহিক একতা, সাবেক অধ্যাপক নটর ডেম কলেজ, সম্পাদক শিক্ষাবার্তা]